ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 923-929
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.307

নারীহৃদয়ের জটিল সমীকরণ: বাদল সরকারের নাটক

ড. পাপিয়া সামন্ত, *অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

After the World War II, modern Bengali theatre began to move along a new path. It shifted from the confined stage of proscenium theatre to open-air, free stages under the influence of the people's theatre movement and new theatrical forms. In this context, during the 1960s and 1970s, playwright Badal Sircar emerged on the Bengali stage, introducing an absurdist, existential theatrical trend. Using the purposelessness of life as his central theme, he created a number of significant plays that came to be known as absurd theatre.

In the course of his dramatic career, Badal Sircar produced several notable and popular plays, where themes of frustration, exhaustion, conflict, sorrow, and alienation from life repeatedly surface. Alongside these, he vividly portrayed the intense conflicts within human life, especially the inner struggles of the female psyche. In particular, in plays like Jodi Aar Ekbar and Pagla Ghora, his depiction of the conflict-ridden female mind is truly remarkable. Although women may not always occupy the central role in these plays, almost all characters and events revolve around women. Through diverse emotional and psychological states, a series of vivid images emerge, giving form to the complex and often unknowable world of the female heart.

In "*Jodi Aar Ekbar*", the playwright primarily portrays the meaninglessness of life. Especially when the female mind is in a state of indecision, it becomes incapable of making the right choices. Enchanted by illusions, it wanders aimlessly, chasing mirages without direction. In reality, the female heart repeatedly ignores harsh realities and seeks refuge in the realm of imagination. However, even upon reaching that imagined world, it fails to find peace, becoming increasingly restless and suffocated, ultimately longing to return to its former life. On the other hand, in "*Pagla Ghora*", the playwright presents a profound philosophy of life. He suggests that "perhaps only by witnessing death can one truly understand life," and emphasizes that "it is never better to die than to live" and that "as long as one life, everything remains possible." Through this, the play presents the conflicts, despair, fatigue, and sorrow of the female psyche. At the center of the play is the dead body of a woman, around which revolve four other female identities. Each expresses their own pain, conflict, frustration, and suffering. These varied female forms appear as different manifestations of a single feminine essence in the lives of different men. Although the playwright presents life through the lens of death, he skillfully gives language to the unexpressed pain of the female heart.

Keywords: Second World War, Third Theatre, Female Psychology, Conflict and Crisis

যে পাশ্চাত্য ধারার আভরণ পরিধান করে বাংলায় নাট্যশিল্পের আগমন ঘটে, সেই নাট্যশিল্প কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে বাংলা নাটকের স্রোত একেবারে ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করে। বাংলা নাটক প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বদ্ধ মঞ্চ থেকে আত্মপ্রকাশ করে গণনাট্য-নবনাট্যের মুক্তপ্রাঙ্গণে। এরই সূত্র ধরে ষাট-সত্তরের দশকের দিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার নাটক নিয়ে উপস্থিত হয় নাট্যকার বাদল সরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকার সঙ্গে দাঙ্গা, দেশভাগ ও পরিশেষে স্বাধীনতা প্রাপ্তি সমকালীন সামজিক-রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে মানব জীবনকে চূড়ান্তভাবে পীড়িত করে। বিশেষত সমকালীন সময় জুড়ে মানবমনে জন্ম নেয় দ্বন্দ্ব-হতাশা-বিষাদ-অনিশ্চয়তা। এমনই সময়পর্বে বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিকল্প থিয়েটার তথা থার্ড থিয়েটারের ডালি নিয়ে আবির্ভাব ঘটে বাদল সরকারের।

পাশ্চাত্য ভাবধারায় সুপুষ্ট এই নাট্যকার মানবজীবনের ক্লেশ-গ্লানি-রিক্ততাকে আভূষণ করে প্রবর্তন করেন বাস্তববিমুখ শূন্যতাবাদী ভিন্ন এক নাট্যধারা। যেখানে উঠে আসে মানুষের একঘেয়েমি জীবনযন্ত্রণা। আসলে আধুনিক যুগের নাট্যকার বাদল সরকার ছিলেন জীবনের প্রতি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণকারী। ফলত তাঁর নাটকে অনায়াসে উপস্থিত হয়েছে জটিলতাসমৃদ্ধ মানবজীবন। নাট্যকার তাঁর নাটকগুলিতে দেখিয়েছেন কীভাবে মানব জীবন জটিলতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে একেবারে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর পথকে উন্মুক্ত করে। নাট্যকার বাদল সরকার রচিত নাটকগুলির মূল কেন্দ্রে অবস্থান করছে অনিশ্চয়তায় ভরপুর হতাশাগ্রস্ত মানবমন। এই মানবমনের বিশেষত নারীমনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়ে উঠেছে নাট্যকারের নাটকের প্রধান হাতিয়ার।

মানবমন কিংবা নারীমন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমাদের জেনে নিতে হবে প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনঃবিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব। সিগমুণ্ড ফ্রয়েডেই প্রথম আঙুল তোলেন মানব হৃদয়ের জটিল রহস্যময় গোপনতম প্রদেশগুলির দিকে। যেখানে উন্মোচিত হয় চেতন, অবচেতন ও অচেতন মন। বিজ্ঞানী ফ্রয়েডই প্রথম সন্ধান দেন মানুষের চেতন মনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে মূল চালিকাশক্তি হল অবচেতন মন। বলা চলে, মানব মনের নিয়ামক শক্তি হল অবচেতন মন। আর এই অবচেতন মনের ক্ষেত্র হয় অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। ফ্রয়েড আবার অন্যদিকে মানবমনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, মানবমন তিনটি উপাদানের সমাহারে গঠিত- ইড, ইগো, সুপারইগো। ইড বা অদ্‌স মানুষের মধ্যে অবস্থিত স্বার্থান্বেষী অনৈতিক চিন্তা, যা প্রতিমুহূর্তে মনকে ভোগ তথা আত্মতুষ্টির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অপরদিকে সুপারইগো মানবমনকে নৈতিক দিকে উপস্থাপিত করে। ঠিক ভুল বিচার-বিশ্লেষণ করে নির্দেশিকা তৈরি করে দেয়। আর ইড ও সুপারইগোর মধ্যবর্তী সংযোগরক্ষাকারী উপাদান হল ইগো। এটি মানবমনের তিনটি স্তরেই বিরাজ করে। তবে বাস্তবসম্মত চিন্তার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে ইগো। বলা যায়, বাস্তব নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ইড-জাত ইচ্ছাসমূহকে সামাজিক ন্যায়সঙ্গতার সঙ্গে পূরণের প্রচেষ্টা করে ইগো।

কিন্তু এই মনস্তত্ত্বের কথা বললে নারী-পুরুষ উভয়েরই কথা আসে। আর পুরুষ ও নারীর মনস্তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। কারণ উভয়ের মনস্তাত্ত্বিক জগত গঠিত হয় প্রকৃতিগত স্বভাববৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে। পুরুষের মনস্তত্ত্ব যেমন তার প্রকৃতিগত সত্তার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তেমনি নারী মনস্তত্ত্বের প্রকৃতি গড়ে ওঠে তার সত্তার ওপর নির্ভর করে। যেখানে তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে স্থান লাভ করে প্রেম, সংযম, সহিষ্ণুতা, মাতৃত্ব। প্রথমদিকে নারী পুরুষের অবস্থান সমপর্যায়ে থাকলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কঠোর বিধি ব্যবস্থায় নারী হয়ে ওঠে পেছন সারির যাত্রী, ঘৃণা-অবহেলার পাত্র। আর তখনই নারীর মনে উদয় হয় দ্বন্দ্ব-বিষাদ-হতাশা। কাঠিন্যতায় ভরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানা সামাজিক সংস্কারে পদপৃষ্ট হয় নারীর ভাব-কল্পনা। ফলত অধরা থেকে যায় নারী মনের সমস্ত স্বপ্ন-আশা-ভাব-কল্পনা। নারী তার অবচেতন

মনে সৃজন করে চলে তার কল্পনার জগত। যেখান থেকে কেউ তাকে সরাতে পারে না। যদিও এই অবচেতন মনে থাকা ভাব-কল্পনার প্রভাব পড়ে নিজের জীবনে, সাথে পারিপার্শ্বিক জীবনে। ফলত বহির্জগত ও অন্তর্জগতের মধ্যে শুরু হয় তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত। বহির্জগতে নারী হয়ে ওঠে রহস্যময়, বৈচিত্র্যময়। নারী হৃদয়ের অতল গভীরে থাকা ভাব-কল্পনা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মনের ভেতর তিল তিল করে গড়ে ওঠা স্বপ্ন থেকে যায় অধরা। তাইতো বিশ্বের তাবড় তাবড় সাহিত্যিকগণ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন সুগভীর নারী হৃদয়ের রহস্যকথাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই বলেছেন-নারীর মনের কারখানা-যেখানে নারীর হাসিকান্না, পাওয়া না পাওয়া, কামনা-বাসনা, ঈর্ষা-দ্বেষ প্রভৃতি অন্তর্গূঢ় রহস্যের ইতিহাস চাপা পড়ে আছে।

আর এই নারীমনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে বাদল সরকারের নাটকগুলিতে। বিশেষত 'যদি আর একবার' (১৯৬৬) ও 'পাগলা ঘোড়া' (১৯৬৭) নাটকে নারী হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাত উঠে এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। মাত্র দুটি অঙ্কে সমন্বিত 'যদি আর একবার' নাটকের মূলে রয়েছে জীবনের প্রতি অর্থহীনতা তথা মূল্যহীনতা। নাটকটি ১৯৬৬ সালে রচিত হলেও প্রথম অভিনয় হয় বহুরূপী কর্তৃক অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ (২৬ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬)। হালকা মেজাজের এই নাটকে খুব সন্তর্পণে প্রবেশ ঘটিয়েছেন মানসিক দ্বন্দ্বকে। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সমাজ হয়ে উঠেছিল নিরাশার যুগ। যেখানে প্রাধান্য পেতে থাকে কেবল দ্বন্দ্ব-হতাশা-যন্ত্রণা-বিষাদ। নাট্যকার এই নাটকে নারীর হৃদয়ের বিচিত্র গতিকে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। নাটকটিতে রয়েছে তিনজন নারী চরিত্র- বনলতা রায়, যে অবিবাহিতা, চাকুরীজীবী, স্বাধীনচেতা মনোভাবের অধিকারী। দ্বিতীয়জন করুণা, যে সরকারী উচ্চপদস্থ অফিসার ধনীব্যক্তি রতিকান্ত সান্যালের স্ত্রী। তৃতীয়জন অতসী, যে লেখক সঞ্জয় ঘোষের স্ত্রী। এই তিননারীর হৃদয় ভাবনা তথা মনোগত বাসনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই তিন নারীর অবচেতনে থাকা কামনা-বাসনার বিচিত্র স্তরের মধ্য দিয়েই নাটকের কাহিনি ক্রম বিবর্তিত হয়েছে।

নাটকের শুরুতেই দেখা যায়, এই তিন নারী নিজের নিজের পরিবারের সঙ্গে বঙ্গ উপসাগরের কূলে ভ্রমণে এসেছে। প্রত্যেকেই বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিয়েছে উপসাগরের কূলে অবস্থিত সত্যসিন্ধু শেঠের সুন্দর মনোরম হোটেলে। আর এই হোটেলই এই নাটকের কাহিনিস্থল। এখানেই পরিচিত হয় একে অন্যের সঙ্গে। সেই পরিচয় সূত্রেই উঠে আসে প্রত্যেকের অন্তর্জগতের বিচিত্র মনোবাসনা। বিশেষত তিন নারী চরিত্রের নিজ নিজ অবস্থান সম্পর্কে তিনজনেরই মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত আমাদের ভাবনায় ফেলে দেয়। কোন নারীই তার নিজ অবস্থানে সুখী নয়, সে চায় বিপরীত অবস্থানে থাকা অন্যের স্থানটি অধিকার করতে। কারণ তার কাছে অন্যের স্থান অনেক বেশি সুখকর, অনেক বেশি শান্তিদায়ক। এ যেন 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস'। যেমন বনলতা চায় করুণার স্থান অধিকার করতে, অপরদিকে করুণার বাসনা সে বনলতার ন্যায় স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে। স্বামীর অধীনে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে নারাজ করুণা। স্বামী রতিকান্তর বিপুল অর্থের প্রাচুর্যে দমবন্ধ হয়ে আসে তার। সে চায় বনলতার ন্যায় মুক্ত স্বাধীন জীবন। নিজে চাকরি করে, নিজের রোজগারে, স্বাধীনভাবে জীবন উপভোগ করতে চায় করুণার মন। তাই সে বনলতাকে বলে ওঠে-

> "...আমি শুধু চাই
> যেটুকু বিদ্যে আছে সম্বল করে
> কোনো এক নিরুদ্বেগ সাদাসিধে
> চাকরির স্বাধীনতা। বিবাহিত জীবনের দাসত্বের অপমান থেকে
> মুক্তি চাই শুধু। যে মেয়ের ঐটুকু আছে,

তাকে আমি হিংসে করি, তোমাকেও হিংসে করি
এই কারণেই।"[১]

যে বিবাহিত জীবন করুণার কাছে দাসত্ব হয়ে উঠেছে, তার স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিচ্ছে, তার কণ্ঠরোধ করছে, সেই বিবাহিত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে আগ্রাসী মিস্ বনলতা সেন। কারণ বনলতার নিকট একাকীত্ব হয়ে উঠেছে একঘেয়েমি, অসহ্যকর। বিবাহিত জীবন, সংসার জীবন তার কাছে ঈশ্বরের দান। তাই সে করুণার ন্যায় জীবনের প্রত্যাশা করে বলে ওঠে-

"স্বাধীনতা দেখো, হিংসে করো, একা থাকা কাকে বলে কিছুই জানো না, যা পেয়েছো জীবনের দান, তার জন্য ধন্যবাদ দিও বিধাতাকে।"[২]

জীবনে পাওয়া-না পাওয়ার অতৃপ্ত বেদনায় নারীমন হতাশা ও ক্লান্তি বোধ করে। দুই প্রকৃতির নারীর মনে সুখ নেই। উভয়ের মধ্যে থাকা বিপরীত জীবনভাবনা তাদের ক্লান্তি, হতাশাগ্রস্থ করে তোলে। একদিকে একাকী নারী সংসারের বন্ধনে বাঁধা পড়তে চায়, অপরদিকে সংসারে থাকা নারী সংসারের দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়।

নাটকের অপর এক নারী চরিত্রকে পাই- অতসী। যেখানে সে পিতার ঐশ্বর্যকে পায়ে ঠেলে নিজের ভালোবাসাকে তথা সঞ্জয়কে বরণ করে নিয়েছিল, একসাথে পথ চলার শপথ গ্রহণ করেছিল, সেই অতসী অর্থহীনতার কারণে সঞ্জয়ের কাছ থেকে মুক্তি লাভের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। কারণ বিবাহের পর অর্থহীনতার কারণে জীবনের সমস্ত শখ-আহ্লাদ তার কাছে অধরা। তাই অতসীর মনে হয়-

"সব স্বপ্ন। সব মিথ্যে আশা। জীবনের প্রথমেই গোলমাল হয়ে গেছে সব, ফেরবার উপায় তো নেই।"[৩]

আসলে অর্থহীনতা অতসীকে দাঁড় করিয়েছে বাস্তবের রূঢ় কঠিন বাস্তবের মাটিতে। অর্থহীনতার কারণে তার কাছে সঞ্জয়ের শিল্পীসত্তা হয়ে উঠেছে মিথ্যে, অর্থহীন। নিতান্তই বুজরুকি। তাই বনলতার মুখে শিল্পীসত্তার প্রশংসা শুনে ক্ষোভের সঙ্গে বলে ওঠে-

ঝাঁটা মারি কালচারের মুখে! চাল নেই, চুলো নেই, কালচার ধুয়ে খাবো! (১/২)[৪]

শিল্পী সঞ্জয়কে বরণ করা তাঁর জীবনের সবচেয়ে ভুল সিদ্ধান্ত। তাই সে বনলতাকে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদান করে জানায়-

বনলতা, যদি বিয়ে করো, কালচার ছেড়ে ভাই কারবারি ধরো। (১/২)[৫]

যে শিল্প, যে সৃষ্টিকার্য তাদের অন্ন যোগান দিতে পারে না, যে শিল্প তাদের দিনের পর দিন স্টার্ভেশনে রাখে, সেই শিল্প অতসীর কাছে হাস্যকর, মিথ্যে। যা অতসীর খেদোক্তিতে সুস্পষ্ট বিদ্যমান-

"লিখে ক'টা টাকা আসে ভাই পোড়া বাংলাদেশে?
.....
টাকা সব নয় জানি। কিন্তু যদি ভদ্রভাবে চলাটাও
শক্ত হয়, যদি ফেস্ করো স্টার্ভেশন- মানে উপবাস..." (১/২)[৬]

প্রত্যেকের এই অতৃপ্তিবোধ তাদের অন্য সুখকর জীবনের হাতছানি দেয়। একাকী স্বাধীন বনলতাও হাঁপিয়ে ওঠে তার একঘেয়েমি জীবনযাপনে। করুণার স্থান লাভে আশাবাদী বনলতা তোলে যোগ্যতার প্রশ্নচিহ্ন। যোগ্যতার মাপকাঠিতে বনলতা নিজেকে বসায় শীর্ষস্থানে।

"একজন পেয়েও বোঝে না কতখানি পেলো, যা পেয়েছে পায়ে ঠেলে নষ্ট করে! অথচ হয় তো অন্য কেউ অপেক্ষায় মরে। হয় তো পাবার কথা তারই যোগ্যতার কথা যদি ওঠে।"[৭]

তবে 'বুড়ঢা জিন'-এর আশির্বাদ নাটকের সকল চরিত্রকে উপনীত করে নিজ নিজ কল্পনার জগতে। যেখানে নাটকের সবাই নিজস্ব জীবন থেকে এক ভিন্ন জীবনের প্রান্তে উপস্থিত হয়। তাদের অবচেতন মনে থাকা কল্পনার জগতে তারা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই জীবন তাদের প্রত্যেককে ক্লান্ত করে। বনলতা, করুণা, অতসীর অবচেতন মনে যে জীবন, যে চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে ছিল, বুড়ঢা জিনের ম্যাজিকে তা পূরণ হলেও সেখানে প্রত্যেকেই পূর্ব জীবন ফিরে পেতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কেউই চায় না এমন আকাঙ্ক্ষিত জীবন। রুচি, শিক্ষা, বৈদগ্ধের ভারাক্রান্তে অতসী ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নতুন জীবনের সীমাহীন বিলাসিতার প্রাচুর্যে দমবন্ধ হয়ে আসে অতসীর। অপরদিকে বনলতা ও করুণাও হাঁপিয়ে ওঠে নতুন জীবনে। রতিকান্তের প্রেমলীলা বনলতার কাছে হয়ে ওঠে একঘেয়েমি, অসহ্যকর। আবার করুণার কাছে একাকীত্ব হয়ে দাঁড়ায় বিষময়। তাই অতসী বলে ওঠে- "ওঃ কী ভুল করেছি'।[৮]

আসলে নাট্যকার দেখিয়েছেন মানুষের অবচেতনে মনে থাকা গোপন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ঘটলেও সেখানে জীবনের সকল সুখ খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং ইচ্ছামতো জীবন পাওয়ার চাইতে, জীবন থেকে পাওয়া জীবনটাকে মেনে নিলেই সর্বসুখ।

অপর নাটক 'পাগলা ঘোড়া'-তেও একই রকমভাবে উঠে এসেছে নারী মনের তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত। উক্ত নাটকটিও সর্বপ্রথম অভিনীত হয় বহুরূপী কর্তৃক অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ ১৯৭১ সালে ২৮শে ফেব্রুয়ারি। মাত্র দুটি অঙ্কের মধ্যেই নাটকের পরিসমাপ্তি টেনেছেন। সমগ্র নাটকে প্রধান চরিত্র হিসেবে না এলেও কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে 'মেয়েটা'-র উপস্থিতি নাটকটিকে চমৎকারিত্ব এনে দিয়েছে। এই নাটকের ঘটনাস্থল শ্মশান। যেখানে পুড়ছে একটি মেয়ে তথা 'মেয়েটা'। নাট্যকার এখানে 'মেয়েটা' বলেই সম্বোধন করেছেন। নির্দিষ্ট কোন নাম দেননি। তবে এই মেয়েটাই কখনো মালতী, কখনো মিলি, কখনোবা লছমী বা লক্ষ্মী। নাটকে প্রধান চারটি পুরুষ শশী-কার্তিক-হিমাদ্রি-সাতকড়ি আবর্তিত হয়েছে মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই। আবার এই 'মেয়েটা'-ই ভিন্ন ভিন্ন নারী রূপে উপস্থিত হয়েছে। এক মেয়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নারী চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নাটক হয়ে উঠেছে তীব্র সংঘাতপূর্ণ।

নাট্যকার উক্ত নাটকে শ্মশানের পটভূমিতে জীবনের অনুসন্ধান করেছেন। নাটকের শুরুতেই আমরা দেখি, চারজন শ্মশানযাত্রী একটি অল্পবয়সী মেয়ের শবদাহ শ্মশানে নিয়ে এসেছে দাহ করতে। আর এই দাহকার্য চলাকালীন চার ব্যক্তির আলাপচারীতার মধ্য দিয়ে উঠে আসে সমাজে নারীর অসাহায়তা ও দুর্ভাগ্যের চিত্র। নাট্যকার মৃত মেয়েটার অস্তিত্ব জুড়ে উপস্থাপন করেছেন আরো তিনটি নারী চরিত্র। তীব্র জীবন যন্ত্রণায় লালিত মেয়েটার অবয়বের মধ্যে ফুটে ওঠে অত্যাচারিত তিনটি নারীর অবয়ব- মালতী, মিলি, লছমী। যে মালতী ভালোবেসেছিল শশীকে, সেই মালতীকে বিয়ে করতে উদ্যত হয় মদ্যপ, লম্পট শশীর ভাই প্রদীপ। শুধুমাত্র সমাজ ও মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে শশী হৃদয় দিয়ে ভালবাসলেও মালতীকে গ্রহণ করতে পারে না। মালতীর কাতর অনুনয়, প্রেম কোনোকিছুই টলাতে পারেনা শশীকে। শশীর সামাজিক অবমাননার ভীতি মালতীকে টেনে নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। মালতীর সেই অতৃপ্ত সত্তা 'মেয়েটা'-র মধ্য দিয়ে বলে ওঠে-

> "তোমার জিত। তোমার নিজের উপর জিত। পেরেছো তুমি। ভেসে যাওনি, খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছো। নিজের কাছে হেরে যাওনি তুমি।"[৯]

শুধুমাত্র সামাজিকতার কারণে শশী তার প্রেমের হত্যা করে। যে হত্যার প্রতিফল মালতীর মৃত্যু। নারীর হৃদয়ের গোপনে থাকা সুগভীর ভালোবাসাকে পিষে ফেলে শশী। যেখানে নারীর ভালোবাসার কাছে সমাজ হয়ে ওঠে অনেক বড়। মালতীর এই অন্তর্বেদনা জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে 'মেয়েটার' মধ্যে।

অপরদিকে আবার মেয়েটার অস্তিত্বে জাগ্রত হয় মিলি। যে মিলি উচ্চবিত্ত সমাজের মেয়ে। অসামান্য ধনী সুন্দরী মিলি সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত স্কুল টিচার হিমাদ্রিকে ভালোবাসলেও হিমাদ্রি তার সেই শুদ্ধতম ভালোবাসার সঠিক মর্যাদা দেয়নি। অন্যদিকে হিমাদ্রির প্রতি মিলির অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও আত্মসমর্পণে মিলি নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায়। উভয়ের মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অবশেষে দুজনের পথ আলাদা হয়ে যায়। আসলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের গণ্ডীতে আবদ্ধ হিমাদ্রী কিছুতেই তার জীবনের সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না। হিমাদ্রীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করলেও মিলির ভালোবাসাকে বরণ করে নেওয়ার সাহস বা শক্তি কোনোটাই নেয় হিমাদ্রীর। এখানে নাট্যকার অসাধারণ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন সামাজিক বৈষম্যকে। যে বৈষম্যের শিকার মিলি-হিমাদ্রী। যেখানে মিলি সমাজের বৈষম্যকে তোয়াক্কা না করে হিমাদ্রীর জগতকে আপন করে নিতে চেয়েছে, সেখানে হিমাদ্রী নিম্ন-মধ্যবিত্ত সুলভ ভীরুতায় বারবার পিছু হটেছে-

> "হিমাদ্রী: তোমার আমার জগতের এতো তফাৎ যে- মিলি: জগতের তফাৎ। জগতের তফাৎ। তোমার কাছে তোমার জগতটাই সব। আমি কিছু না। আমাকে তোমার কোনো দরকার নেই। (দ্বিতীয় অঙ্ক)[১০]

মিলি তার সর্বস্ব অর্পণ করে দিতে চায়। কিন্তু সামাজিক বৈষম্যের সংস্কারে বশবর্তী হিমাদ্রী নিজের জীবনের সঙ্গে মিলির জীবনকে মেলাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত হিমাদ্রী মিলির ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে মিলির বাবার দেওয়া চাকরিতে ইস্তাফা দেয়। নিজেকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। যেখানে মিলি তাকে কোনদিন খুঁজে পাবে না। হিমাদ্রীর কঠোর সিদ্ধান্ত মিলিতে ভেতর থেকে ভেঙে দেয়। তীব্র যন্ত্রণায় এক বুক হতাশা নিয়ে বলে ওঠে-

> "আমার জগৎ নেই আর। তোমার জগতে ষোলো আনা ঢুকতে পারিনি। কিন্তু আমারটা খুইয়েছি। কিন্তু তাতে তোমার কিছু আসে যায় না।"[১১]

শুধুমাত্র নিজের ভালোবাসার এই অপমান সহ্য করতে না পেরে মিলি বেছে আত্মহত্যার পথ।

উক্ত নাটকে আরও একটি নারী চরিত্রকে আমরা লক্ষ করি আমরা। যে কুলিকামিন লছমী। ঠিকাদার সাতুর জীবনে বহু মেয়ের আগমন ঘটে। তেমনিভাবেই একদিন লছমীও এসেছিল সাতুর জীবনে। ঠিকাদার সাতুর কাছে নারী শুধুমাত্র ভোগ্যপণ্য। কারণ বিবাহিত জীবন নিয়ে সাতুর উক্তি সত্যিই অবাক করে দেয়। তার কাছে বিবাহ শুধুমাত্র নারীদেহ ভোগ করার অধিকার পত্র। আসলে যার জীবনে প্রতিনিয়ত বহু নারীর আগমন ঘটে, তার কাছে বিবাহ শব্দটাই ব্যঙ্গজনক। আর এমনই বোহেমিয়ান চিত্তের অধিকারী সাতুর জীবনে আসে লছ্মী। যে লছ্মী মরিয়া হয়ে উঠেছিল সাতুর সঙ্গে ভালোবাসার ঘর বাঁধার জন্য, যে লছ্মী বাঁচতে চেয়েছিল সাতুকে আঁকড়ে ধরে, যে লছ্মী সাতুকে স্থান দিয়ে ছিল স্বামীর থেকেও উচ্চাসনে, সেই লছ্মীকে ও তার ভালোবাসাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে সাতু। আসলে মিলির ন্যায় লছ্মী নিজেকে অর্পণ করে দেয় সাতুর পদতলে। তাইতো ছেড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ এলে লছ্মী বলে ওঠে-

> "তোমাকে ছেড়ে যাবো- মরলে"[১২]

তবে লছ্মীর শত কাতর অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও লছমীকে দূরে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে সে। প্রতাখ্যাত লছ্মীর সেই তীব্র মর্মযন্ত্রণা সাতু দেখতে পায় মেয়েটার মধ্যে। ঘৃণাভরে তাড়িয়ে দিলেও লছমীর প্রেম-ভালোবাসার স্মৃতি সাতুকে কুরে কুরে খায়। কিন্তু লছমীর এই শুদ্ধতম ভালোবাসা সাতু উপলব্ধি করে তার মৃত্যুতে। তাই সাতুর উপলব্ধি -

> "মরণ দেখলেই বোধ হয় জীবন দেখা সম্ভব"[১৩]

এভাবেই নাট্যকার নাটকে ভিন্ন ভিন্ন নারী চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে একটি নারীর মধ্যে তুলে ধরেছেন। যেখানে নাট্যকারের অভিনব দক্ষতার পরিচয় মেলে। আবার কম্পাউণ্ডার কার্তিক ও তার গল্পের মেয়ের যে

কাহিনি সেখানেও উঠেছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। কার্তিকের কম্পাউণ্ডারে আসা মেয়েটি জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে বিষ চায়। জীবন তার কাছে হয়ে উঠেছে অসহ্য। মনের গহীনতায় বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছা থাকলেও জীবন যন্ত্রণার কাছে পরাজিত মেয়েটি বলে ওঠে-

> "বেঁচে – কী হয়? মানুষ বাঁচতে চায় কেন? কী পায়?"[১৪]

তীব্র হতাশায় বলে ওঠে-

> "সত্যি বলছি- যন্ত্রণা আমি চাই। যন্ত্রণাও হয় না বলে- আপনার কাছে- বিষ চাইতে এসেছিলাম। আমি মরতে চাই না। আমি বাঁচতে চাই- যন্ত্রণা চাই।"[১৫]

তথাপি মৃত্যুকে বরণ করে নেয় মেয়েটি। মেয়েটি শুধুমাত্র জীবন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই তো কার্তিক বলে ওঠে-

> "বেঁচে থাকলে সবই সম্ভব।"[১৬]

আসলে এই নাটকে প্রত্যেকের গল্প আলাদা হয়েও শেষে এক হয়ে যায়। এই তিন নারীর হৃদয় দ্বন্দ্ব সব শেষে মৃত্যুতেই সমাপ্ত হয়। অথচ এই নারীদের মনে ছিল বেঁচে থাকার তীব্র বাসনা। নারীমনের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু সে সময়কার সমাজে নয়, বর্তমান সমাজেও প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো নারী ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হয়ে চলেছে। যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের ভার সহন করতে না পেরে জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তথাপি নাট্যকার নাটকের শেষ মুহূর্তে এসে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। তাই তো নাট্যকার বলেছেন- "মরণ দেখলেই বোধ হয় জীবন দেখা সম্ভব।/ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো হয় না কখনো।"[১৭] এভাবেই নাট্যকার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে উপস্থাপিত করলেও নারী হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণা-ব্যথা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সুনিপুণ রূপ পেয়েছে এই দুই নাটকে।

তথ্যসূত্র:

১) সরকার, বাদল। বাদল সরকার নাটক সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪১৭, পঞ্চম মুদ্রণ, জৈষ্ঠ্য ১৪৩০, পৃ. ২০৩।
২) তদেব, পৃ. ২০২।
৩) তদেব, পৃ. ২০৪।
৪) তদেব, পৃ. ২০১।
৫) তদেব, পৃ. ২০১।
৬) তদেব, পৃ. ২০১।
৭) তদেব, পৃ. ২০১।
৮) তদেব, পৃ. ২১৩।
৯) তদেব, পৃ. ৩৮৮।
১০) তদেব, পৃ. ৪২২।
১১) তদেব, পৃ. ৪২৩।
১২) তদেব, পৃ. ৪২৩।
১৩) তদেব, পৃ. ৪১১।
১৪) তদেব, পৃ. ৪৩৪।
১৫) তদেব, পৃ. ৪৩৫।
১৬) তদেব, পৃ. ৪৩৮।
১৭) তদেব, পৃ. ৪৩৮।